নবজাগরণ, রবীন্দ্রনাথ ও বর্তমান সাংস্কৃতিক আন্দোলন

এই আলোচনায় কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতবর্ষের নবজাগরণের যে যুগে রবীন্দ্রনাথের অবস্থান — সে যুগের বৈশিষ্ট্য কী তা তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবতাবাদের যে ধ্যান-ধারণা, রুচি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধ বিদ্যমান ছিল সেগুলি উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী সাহিত্য, সংস্কৃতি, মহৎ চিন্তা-ভাবনা চর্চার মাধ্যমে সমগ্র দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, সেই মানবতাবাদই আজ নিঃশেষিত হয়ে কীভাবে শোষক শ্রেণির শোষণের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে তা উল্লেখ করেছেন। আজকের যুগের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী চিন্তা-ভাবনার সীমাবদ্ধতা ধরিয়ে দিয়ে, তার সাথে দর্শনগত ছেদ ঘটিয়ে কীভাবে সর্বহারা সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে হবে তাও চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

ভারতবর্ষের নবজাগরণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এবং তার ধারাবাহিকতায় বর্তমানের সাংস্কৃতিক আন্দোলন কী ধরনের হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটা আপনাদের সামনে আমি রাখতে চাই তা হল, রবীন্দ্রনাথ এদেশের সাংস্কৃতিক জীবন ও চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে অত্যন্ত গভীর ভাবে জড়িয়ে আছেন। ... রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যাপ্তি নিয়ে মানবতাবাদী চিন্তাধারা এদেশে আর কোনও সাহিত্যিকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়নি। যদিও বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের অর্থে মানবতাবাদী চিন্তার পূর্ণতা এবং তাকে অতিক্রম করে সর্বহারাশ্রেণির চিন্তার কাছাকাছি চলে যাওয়া শরৎচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল একথা সত্য, কিন্তু মানবতাবাদী চিন্তার ব্যাপ্তি ছিল রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক বেশি। তাই রবীন্দ্রনাথকে না বুঝলে আমরা আমাদের দেশের মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলোর পুরো কাঠামো এবং তার সমস্ত দিকগুলোকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারব না। এখানেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে অমর, অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক হিসাবে এবং তাঁর সাহিত্যচিন্তা জাতির কাছে অত্যন্ত

প্রয়োজনীয় সাহিত্যচিন্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ... রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এদেশে বহু আলোচনা হয়েছে — বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে এবং থাকাটাই স্বাভাবিক।

প্রথমেই আমি মনে করি, কোনও একজন সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তা সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের সামনে বিচারের একটা সাধারণ মাপকাঠি থাকা দরকার। তা নাহলে আমরা সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হব না। আমরা প্রত্যেকে যার যার মতো করে নিজের নিজের যুক্তিধারা অনুযায়ী এগোবার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু তার দ্বারা একটা ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মধ্যে গড়ে উঠবে না। আর সেটা গড়ে না উঠলে জাতি হিসাবে আমরা তার পরবর্তী পদক্ষেপও ঐক্যবদ্ধভাবে ও সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারব না। আমাদের মূল্যায়ন যদি সঠিক না হয়, অন্তত আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ, যাঁরা ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই, তাঁদের মধ্যে যদি অতীতের সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্বন্ধে মূল্যায়নে একটা ঐক্য না থাকে, আমাদের মধ্যে একটা সমদৃষ্টি না থাকে, উপলব্ধির একটা সমতা না থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন আমরা করব, তার মধ্যে সে সমতা প্রতিফলিত হতে পারে না।

যে কোনও একজন মনীষী বা যে কোনও একজন বড়মানুষ সম্পর্কে যদি সঠিক মূল্যায়ন আমরা না করতে পারি, তাহলে দু'রকম বিচ্যুতি হয় — হয় অন্ধ বিরুদ্ধতা, না হয় অন্ধ স্তাবকতা। হয় আমরা অন্ধ স্তাবকতার রাস্তায়, আর না হয় অন্ধ বিরুদ্ধতার রাস্তায় যার যার মতো 'যুক্তি' করে করে এগোব। দুটোই অন্ধতাপ্রসূত। এ দুটোর কোনটাই আমাদের সঠিক মূল্যায়নের পথকে নির্দেশ করবে না। মনে রাখা দরকার, কোনও একজন মানুষ যথার্থই যতখানি মহৎ, তাঁর সেই মহত্ত্বের উপলব্ধি যদি আমাদের না থাকে, যদি তাঁকে আমরা খাটো করে দেখাই, সেটা আমাদের অন্ধতা এবং অজ্ঞানতা। এর দ্বারা আমরা তাঁকে ছোট করতে পারি না, বরং নিজেরাই ছোট হই। আবার একটা মানুষকে যদি যা নয়, তাই বলে আমরা বড় করে তুলতে চাই, সেটাও আমাদের অজ্ঞতারই পরিচায়ক। না বুঝে একজন মানুষকে বড় করতে চাইলে সে মানুষটি যতটা বড় ছিল তার থেকে বেশি বড় হয় না। বরং অযথা বড় করতে গেলে মানুষটিকে বাস্তবে নামানো হয়। তাই মনগড়া বিচারে সঠিক মূল্যায়ন পাওয়া যেতে পারে না। প্রত্যেক মানুষ তার ব্যক্তিগত উপলব্ধিকেই যদি বিচারের মাপকাঠি ধরে নেন — অর্থাৎ 'আমি যেমন বুঝলাম, আমার যেমন মনে হল, আমার যেমন ভাল লাগল, আমি তার ভিত্তিতে বলব', এটাই যদি প্রত্যেকের বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে আমরা কোনও সাধারণ সত্যে পৌঁছতে পারি না, সত্য নির্ণয় করতে পারি না। তখন সত্য হয়ে

পড়ে প্রতিটি ব্যক্তির উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা একটা ধারণা। সেখানে কোনও একটা সাধারণ সত্যের অবস্থানই থাকে না। কিন্তু আমরা জানি, কোনও বিশেষ অবস্থায় বিশেষ একটা বিষয় সম্পর্কে সত্য ধারণা একটাই। কারোর ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপরে সত্যটা নির্ভর করে না। যথার্থ সত্য নির্ধারণ করার একমাত্র উপায় হল বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি হচ্ছে এমন জিনিস, যেখানে ব্যক্তির উপলব্ধিকে ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে হয়। 'আমার উপলব্ধি, আমার ভাললাগা-মন্দলাগা, আমার বিশ্বাস, আমার যুক্তি' — এই কথাগুলো যদি বিজ্ঞানের ধোপে, ইতিহাসের ধোপে, যুক্তির ধোপে না টেকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমার বিচারের মাপকাঠিটায় ভুল আছে, সেটা আমাকে সংশোধন করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি আমাদের সামনে না থাকে, তাহলে আমরা সত্যে পৌঁছতে পারি না। এজন্যই বিজ্ঞানের সহায়তা আমাদের নিতে হবে। তা না হলে আমরা শুধুমাত্র আবেগের বশীভূত হয়ে পড়ব — সেটা স্তুতি করার আবেগই হোক, অথবা বিরুদ্ধতা করার আবেগই হোক। মনে রাখতে হবে, তার দ্বারা কোনও মনীষীর বা সাহিত্যিকের চিন্তার যথার্থ মূল্যায়ন করতে আমরা পারব না।

যাকে আমরা কোনও সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তা বলি, সেটা কী? একটা সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব, শ্রেণিতে শ্রেণিতে দ্বন্দ্ব, সমাজের উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের দ্বন্দ্ব কাজ করছে। সমাজ অভ্যন্তরে মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে এইসব নানান দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে। আবার, অন্যদিকে সমাজের সমগ্র মানুষকে নিয়ে যদি একটা দিক ধরা যায়, তাহলে আর একটা দিক হচ্ছে প্রকৃতি, যার সঙ্গে সমগ্র মানুষের সংঘাত চলছে। এই দ্বিতীয় ধরনের সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতিকে জানছি, তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করছি এবং তাকে আমরা মানব সমাজের কল্যাণের কাজে, সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের কাজে লাগাচ্ছি। এভাবে সমাজ অভ্যন্তরে রয়েছে দু'ধরনের দ্বন্দ্ব সংঘাত, একটা সমাজ অভ্যন্তরে মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আর একটা হচ্ছে গোটা মানব সমাজ এবং প্রকৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এই দুই ধরনের সংঘর্ষে আবর্তিত হয়ে যে চিন্তা সমাজ কাঠামোর মধ্যে গড়ে ওঠে, সেটাই হল সমাজচিন্তা। যে কোনও ব্যক্তির চিন্তা, সাহিত্যিকের চিন্তা, দার্শনিকের চিন্তা সবই আসলে এই সমাজচিন্তার ব্যক্তিগত উপলব্ধি বা ব্যক্তিকৃত রূপ। একটা বিশেষ সময়ে এই সমাজচিন্তার একটা বিশেষ পরিধি বা পরিমণ্ডল থাকে এবং তা স্থান-কালের সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট। একে কারোর পক্ষেই লঙ্ঘন করে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। নেই বলেই আমরা দেখতে পাই, যে কোনও একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থায় সমস্ত রকমের চিন্তা জন্ম নেয়নি। আজকের

সমাজের যে সমস্ত চিন্তা-ভাবনাগুলো আমরা লালন-পালন করি এবং সাধারণ মানুষও অতি সহজে বুঝতে পারেন, তেমন ধরনের চিন্তা-ভাবনাগুলো সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বড় মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সুদূর অতীতে বুদ্ধ, মহম্মদ, যিশুখ্রিস্ট, শংকরাচার্য কিংবা কনফুসিয়াসের মাথায় আসেনি। সেটা এজন্য নয় যে, তাঁদের চিন্তা করার ক্ষমতা বা শক্তি আমাদের চেয়ে কম ছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁর তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। প্রত্যেকেই তাঁর তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মানুষ হওয়ার ফলে তাঁরা তাঁর তাঁর সময়ে চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অনেক কিছু দিয়েছেন, কিন্তু আবার এমন অনেক কিছু বিষয় আছে যেগুলো বিচার করলে আমরা দেখব, তাঁদের মতো বিরাট মানুষদের মস্তিষ্কে বা চিন্তায় সে সময়ে প্রতিফলিত হয়নি, যা পরবর্তী সময়ে তাঁদের চেয়ে অনেক সাধারণ স্তরের মানুষের চিন্তায় আমরা প্রতিফলিত হতে দেখেছি। সেইজন্য 'মানুষের চিন্তার ক্ষমতার কোনও শেষ নেই'— এই কথাটার প্রকৃত অর্থ হল, একটা বিশেষ স্থান-কালের সীমার মধ্যে শেষ নেই। মানুষের 'চিন্তার ক্ষমতার শেষ নেই' কথাটা যদি কেউ স্থান-কালের সীমার ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চান, তাহলে সেটা হবে ভ্রান্ত, অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক।

এখন প্রশ্ন হল, মানুষের সমাজে চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি এগুলো গড়ে উঠল কীভাবে? এগুলো গড়ে উঠেছে সমাজ বিকাশের বা সভ্যতার বিকাশের পথ বেয়ে। আমরা জানি, মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে গিয়ে বাঁচার তাগিদে উৎপাদন করতে আরম্ভ করে। এই উৎপাদন করার বা সৃষ্টি করার দুটো দিক আছে। একটা বস্তুগত সৃষ্টি যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগে, আর একটা ভাবগত সৃষ্টি, যাকে আমরা বলি চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান। একটা মানুষের ভোগের জন্য বা ব্যবহারের জন্য, আর একটা তার মানসিক বিকাশের জন্য — সোজা ভাষায় যাকে বলা হয় দেহের খাদ্য, আর মনের খাদ্য । সমাজ বিকাশের একটা স্তরে এসে মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদনের স্বল্পতা দেখা দিল। অর্থাৎ মানুষের যতখানি প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনের অনুপাতে উৎপাদন যা হচ্ছে তা কম। প্রয়োজন আর স্বল্পতার মধ্যে এই যে বিরোধ, তাকে কেন্দ্র করে ভাবগত ও বস্তুগত দু'রকমের উৎপাদনই পাল্টাতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ, একে কেন্দ্র করে মানুষের মননশীলতারও বিকাশ হতে থাকল, মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থাও পাল্টাতে আরম্ভ করল। এরকম হতে হতে একটা সময়ে এসে দেখা গেল, যে মানুষগুলো সমাজবদ্ধ ভাবে একত্রে উৎপাদন করতে শুরু করেছিল, তারা আর একত্রে থাকল না। উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের অমোঘ নিয়মে তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল — একদিকে শোষক ও অপরদিকে শোষিত। এটা

হয়েছে মানুষ সে সময়ে যা সৃষ্টি করেছে, আর তার যা বর্ধিত প্রয়োজন ক্রমাগত দেখা দিয়েছে, এই দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ। এইভাবে সম্মিলিত সমাজ এক সময়ে এসে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, যাকে আমরা রাজনৈতিক পরিভাষায় বলি, সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হয়ে গেল। তখন মানুষের উৎপাদনের, মানুষের সৃষ্টির কর্তৃত্ব চলে গেল একটা শ্রেণির হাতে। একটা শ্রেণি তার ফল ভোগ করতে শুরু করল, আরেকটা শ্রেণি তার ফল থেকে বঞ্চিত হতে থাকল। যারা বঞ্চিত হতে শুরু করল, তারা আবার সমাজকে পাল্টাবার জন্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নততর করবার জন্য সামাজিক বিপ্লব, রাজনৈতিক বিপ্লব তথা সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন গড়ে তুলতে থাকল। একে কেন্দ্র করে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, মননশীলতাও প্রভাবিত হতে থাকল। এভাবে যখন থেকে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হল, অর্থাৎ শোষক ও শোষিতে ভাগ হয়ে গেল তখন থেকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, কোনও না কোন শ্রেণির সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনা করেই মানুষ সমাজে বসবাস করতে থাকল। এই সম্পর্ক স্থাপনা ব্যতিরেকে কেউই সমাজে বাস করতে পারেন না। একজন মানুষ ভাবতে পারেন, তিনি মালিক-মজুর কোনও শ্রেণিরই লোক নন। কিন্তু এরকম অবস্থান কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়, তা তিনি যত বড় মাপের মানুষই হোন না কেন। আপনি নিজে না ভাবলেও উৎপাদনের সঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেই আপনি বেঁচে থাকেন। আর ওই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আপনি সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে মালিক অথবা মজুর কোনও না কোনও শ্রেণির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং তারই ফলে সেই শ্রেণির ভাবনা আপনি প্রতিফলিত করেন। অর্থাৎ আপনি বা আমি সচেতন হই বা না হই, অথবা কোনও একজন দার্শনিক, চিন্তানায়ক, সাহিত্যিক বা কবি সচেতন হোন বা না হোন — কোনও না কোনও শ্রেণির চিন্তা — অর্থাৎ কখনও মালিক, কখনও শ্রমিকশ্রেণির চিন্তা একইসঙ্গে তিনি প্রতিফলিত করেন। যদিও, উভয় শ্রেণির চিন্তাকে প্রতিফলিত করলেও তার মধ্যে একটা শ্রেণির চিন্তা প্রধান থাকে। ...আমরা যদি গায়ের জোরে এটাকে অস্বীকার করতে যাই তাহলে আমরা অজ্ঞতারই শিকার হই এবং তখন আমরা যে শ্রেণিকে সমর্থন করি না, বা যে শ্রেণির বিরোধিতা করি, সেই শ্রেণির চিন্তাকেই না-জেনে বা না-বুঝে সমর্থন করে বসি — শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি বিচার না করে 'মানবতার' নামে,'সকল শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করছি', 'সকল মানুষের স্বার্থরক্ষা করছি' ভেবে হয়ত শোষক শ্রেণিকেই সমর্থন করে বসি। মনের দিক থেকে সেই শ্রেণির চিন্তাকে হয়তো আমি সমর্থন করতে চাইনি, তবুও করে বসি। তাই, সচেতনভাবে কোনও চিন্তার শ্রেণিচরিত্র নির্ধারণ করাই হল প্রত্যেক যুগের সাহিত্যচিন্তা অথবা কাব্যচিন্তা বিচারের

বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠি। অর্থাৎ বিচার করে দেখতে হবে যে, সেই সাহিত্যিক বা কবি জেনে হোক বা না-জেনে হোক, তাঁর সময়ে মূলত কোন শ্রেণির চিন্তা প্রতিফলিত করেছেন।

কোনও একজন কবি বা সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তা বা কাব্যচিন্তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বহু রকমের চিন্তা থাকতে পারে। যেহেতু তিনি সমাজের মধ্যে বাস করছেন, তিনি একজন বড় মানুষ এবং সকল মানুষের কথা ভাবছেন এবং কবি সাহিত্যিকরা যেমন বোঝেন তেমন করে যেহেতু বিষয় উত্থাপন করেন, তাই তাঁদের চিন্তার মধ্যে অনেক সময় সমাজের. সমস্ত মহলের চিন্তার প্রতিফলন হয়। সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে, তাঁর মধ্যে কোন শ্রেণির চিন্তাটা প্রধান এবং তার ভিত্তিতে তাঁর চরিত্রায়ণ ও মূল্যায়ন আমাদের করতে হবে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজ, মানে হচ্ছে, একদিকে শোষক আর একদিকে শোষিত। একদল এই শ্রেণিবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজটাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে, আর একদল এই সমাজব্যবস্থাকে পাল্টে ফেলতে চাইছে, সমাজ বিকাশের ও প্রগতির দ্বার খুলে দিতে চাইছে।... তাই কোন শ্রেণি ইতিহাসের কোন স্তরে প্রগতিশীল, কোন শ্রেণি বিপ্লবী; অন্যদিকে কোন শ্রেণি প্রতিক্রিয়াশীল, কোন শ্রেণি প্রগতির পথকে রুদ্ধ করতে চাইছে, আটকাতে চাইছে, তা বিচার করতে হয়। বিচার করে ইতিহাসের সেই বিশেষ স্তরে সমাজ চিন্তার মধ্যে শ্রেণি চরিত্র নির্ধারণ করতে হয়। এটা ঠিক মতো করতে পারলে তবেই সেই বিশেষ সমাজে একজন মনীষী যা কিছু চিন্তা করেছেন, তার বিচারের একটা বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠি আমরা পাই — তিনি তাঁর জীবন ও কর্মের মধ্য দিয়ে মূলত কোন শ্রেণির চিন্তাকে প্রতিফলিত করেছেন তা বুঝতে পারি। তিনি ওই সময়ে যে শ্রেণির চিন্তাকে প্রতিফলিত করেছেন, তা প্রগতিকে কতখানি সাহায্য করেছে, অথবা কতখানি প্রতিক্রিয়াশীল এবং কীভাবে অজানিতভাবে হলেও তা প্রগতির বিরুদ্ধতা করেছে, সেটা বিচার করতে পারি।

... রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে ধারা গড়ে উঠেছিল, একদল সেই রাস্তায় সংস্কৃতির চর্চা করেছিলেন। ... শরৎচন্দ্র, নজরুলদের ধারায় সেদিন যাঁরা সংস্কৃতির চর্চা করেছেন, তাঁরা সামাজিক বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জয়গান গেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, পুরনো সমাজব্যবস্থাকে ভাঙতে হবে, পুরনো নৈতিকতা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অন্ধতা—এসব ভাঙতে হবে। মানুষের নতুন প্রয়োজনে, দেশের নতুন প্রয়োজনে নতুন মূল্যবোধের ভিত্তিতে পুরনো সমাজকে ভাঙতে হবে, নতুন করে সমাজকে পুনর্গঠন করতে হবে। এঁদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভেতর থেকে তখন এই

সুরটি ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। সামাজিক বিপ্লবের প্রয়োজনই তখনকার সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে জন্ম দিয়েছিল। এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তখন দেশের অগণিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাঞ্ছিত ও শোষিত মানুষের সামনে যে নতুন বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল, তা হল — যদি দেশকে এবং জনসাধারণকে আমরা উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, যদি নবচেতনায়, গণতন্ত্রের চেতনায় গোটা দেশকে জাগিয়ে তুলতে হয়, তাহলে ধর্মীয় গোঁড়ামি, সর্বপ্রকার সামাজিক কুসংস্কার এবং পুরনো অন্ধতার যুগ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। রাজা রামমোহন থেকে শুরু করে নজরুলে এসে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভাবধারা মোটামুটিভাবে একটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই ভাবধারার ঠিক ঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হলেই আমরা বর্তমান সময়ে আমাদের করণীয় কাজ কী হবে, তা বুঝতে সক্ষম হব।

...যদি রবীন্দ্র সাহিত্যের, রবীন্দ্র সাহিত্যচিন্তার বা কাব্যচিন্তার মূল আধারটাকে আমরা ধরতে চাই এবং তার থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাই, রবীন্দ্রোত্তর যুগে যেতে চাই, তাহলে আমাদের দেশের নবজাগরণের যে যুগে বা যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি, সেই যুগ বা সময়ের বৈশিষ্ট্যকে ভাল করে বুঝতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির সেই সময়টা হল, যখন আন্তর্জাতিকভাবে পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়ার স্তরে প্রবেশ করেছে, যখন গণতান্ত্রিক সভ্যতা বিকাশলাভ করতে করতে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে তার মধ্যে ক্ষয় ধরেছে, যখন সমগ্র ইউরোপ ও পশ্চিমী সভ্যতা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলছে, মানবতার কথা বলছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বলছে — কিন্তু বাস্তবে সে তার ঝান্ডা ফেলে দিয়েছে এবং সামরিক শক্তি, বলপ্রয়োগ ও অন্যায় অত্যাচারের রাস্তার উপর নির্ভর করে টিকে থাকতে চাইছে। তখনকার সমাজব্যবস্থার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন করলে দাঁড়ায় যে, পুঁজিবাদ আর তখন বিপ্লবী পুঁজিবাদ নেই। একসময় পুঁজিবাদ বিশ্বজোড়া সামন্তী ব্যবস্থার কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে লড়াই করে রাজতন্ত্র, চার্চের আধিপত্য ভেঙে গণতন্ত্র, জাতীয় স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীর স্বাধীনতা এবং ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে 'সেক্যুলার' মানবতাবাদের ঝান্ডা তুলে ধরে এগোতে চেয়েছিল। এই সংগ্রামের বিজয়ের পথে এসেছিল গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীমুক্তি, নারীর স্বাধীনতা এবং জাতীয় রাষ্ট্র। গণতন্ত্রের ভিত্তিতে তার প্রতিষ্ঠা। এইগুলো ইউরোপে প্রবর্তিত হয়েছিল। সেই যুগটাকে আমরা বলি গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ বা জাতীয় বিপ্লবের যুগ, অথবা আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ। সেই যুগে পুঁজিবাদ ছিল বিপ্লবাত্মক। মনে

রাখতে হবে, এই ভাবনা-চিন্তাগুলো ছিল মূলত বুর্জোয়াশ্রেণির। এগুলো ছিল বুর্জোয়া বিপ্লবের ভাবনা-চিন্তা, বুর্জোয়া মানবতাবাদের ভাবনা-চিন্তা। এই চিন্তা-ভাবনাগুলিকে নিয়েই আমাদের দেশে স্তরে স্তরে এক একটি করে ইঁট গেঁথে নবজাগরণের জমি তৈরি হচ্ছিল। একেবারে সূচনাপর্বে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, তারপর বঙ্কিমচন্দ্র এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে এসে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে পাই রবীন্দ্রনাথকে। পরের ধাপে শরৎচন্দ্র-নজরুল এলেন।

... বিশ্বপুঁজিবাদের এরূপ প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিকাশ — জাতীয়তাবোধ, ব্যক্তি স্বাধীনতার চিন্তা এবং এদেশের মানবতাবাদের জন্ম। ফলে বিশ্বপুঁজিবাদী শ্রেণিভাবনার অংশ হিসেবেই এদেশে এগুলো এল বলেই শুরু থেকেই এর ভেতরে পাশাপাশি দু'টি ধারা আমরা দেখতে পাই। পুঁজিবাদী বিপ্লবের প্রথম যুগের — রেনেসাঁসের সময়ের মানবতাবাদের বিপ্লবাত্মক ভাবধারাগুলোও এল, আবার ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিবাদী যুগের জরাগ্রস্ত মানবতাবাদ — যা ধর্মের সঙ্গে আবার আপস করতে চাইছে, আবার জাতিবিদ্বেষের চর্চায় ফিরে যেতে চাইছে, অধ্যাত্মবাদের দিকে মুখ ফেরাচ্ছে — সেই জরাগ্রস্ত মানবতাবাদী চিন্তাধারাও একই সাথে এসে গেল। দু'টি ভাবধারাই এদেশে এসে গেল। ...যদি রামমোহন থেকে নজরুল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ধারা ও গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, অনুরূপভাবে মানবতাবাদী ভাবনা-চিন্তার এই দু'টি ধারা এদেশের সাহিত্যচিন্তায়ও প্রতিফলিত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং নজরুল — এই তিনজনকে নিয়ে ভারতবর্ষের মানবতাবাদী ভাবধারার পুরোপুরি একটা 'ক্যাটিগরি' আমরা পাই। সাংস্কৃতিক ভাবধারার এই পুরো ক্যাটিগরিটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখব, এর মধ্যে দু'টি ধারা পাশাপাশি মিশে রয়েছে। একটি ধারা হ'ল 'সেক্যুলার' মানবতাবাদের ধারা। এর মধ্যে ... শরৎচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা মূলত বস্তুতান্ত্রিক। তাঁর সাহিত্যচিন্তায় যেখানে তিনি ধারাবাহিকভাবে বস্তুতান্ত্রিক থাকতে পারেননি, সেখানে তিনি 'অ্যাগনস্টিক' থেকেছেন। ... আর নজরুলের মধ্যে 'ডোমিন্যান্টলি' 'সেক্যুলার' মানবতাবাদের ভাবধারা প্রতিভাত হয়েছে। অপরদিকে ... আর একটি ধারা ধর্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে মানবতাবাদের মূল্যবোধগুলির সংমিশ্রণ করতে চেয়েছে। এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মূলত রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মানবতাবাদী আন্দোলন যখন পূর্ণ আকার ধারণ করল তখন এই দু'টি ভাবধারাই আমাদের দেশের সাহিত্যচিন্তার মধ্যে, দর্শনচিন্তার মধ্যে প্রতিফলিত দেখতে পাই। ... একটা যৌবনোদ্দীপ্ত মানবতাবাদ, আপসহীন, 'সেক্যুলার', অজ্ঞেয়বাদী—শেকসপিয়ারের সময়ের বা রেনেসাঁসের মানবতাবাদী আন্দোলনের বিপ্লবাত্মক সুর যার মধ্যে

ধ্বনিত হচ্ছে, শরৎচন্দ্র ও নজরুলের মধ্যে যেটা আমরা প্রতিভাত দেখতে পাই। অথচ রবীন্দ্রনাথ যিনি গোটা মানবতাবাদী আন্দোলনে সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন এবং এঁদের চেয়ে অনেক ব্যাপ্তি নিয়ে গোটা সাহিত্যজগৎ ছেয়ে আছেন—তাঁর ভাবনা-ধারণা ও চিন্তাধারার মধ্যে সেই যৌবনোদ্দীপ্ত ও বিপ্লবী 'ফারভার' (উত্তাপ) নেই। তিনিও কিন্তু মানবতাবাদী চিন্তা ও মূল্যবোধের একই সুর প্রতিধ্বনিত করেছেন। সেই 'লিবার্টি' (স্বাধীনতা), 'ম্যান'-কে (মানুষকে) কেন্দ্র করে সেই 'হিউম্যানিস্ট ভ্যালু'র, সেই 'ফ্রিডম'-এর জয়গান — সবই তাঁর মধ্যে রয়েছে। অথচ অতি সূক্ষ্মভাবে এরই সাথে মিশে রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ। এর দ্বারা আমি মোটা অর্থে ধর্ম বা ধর্মান্ধতার কথা বলছি না। আমি যা বলতে চাইছি তা হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব, অর্থাৎ 'স্পিরিচুয়ালিজম'-এর সঙ্গে মানবতাবাদী মূল্যবোধের একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে।

... মনে রাখতে হবে, শিল্পবিপ্লব আমূল পরিবর্তন সাধন করেছে সমাজ কাঠামোর। বুর্জোয়ারা সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ভেঙে বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ বিপ্লব সফল করেছিল। কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেও বুর্জোয়ারা শ্রেণিগত ভাবে শেষ পর্যন্ত ধর্মের বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম করে যেতে পারেনি। 'এসেন্স অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি'র সঙ্গে তারা মানবতাবাদকে মিলিয়েছিল। এটা ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ধর্মান্ধতা নয়, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা নয় — দেখা যাবে, মানবতাবাদের সঙ্গে ধর্ম খাদ হয়ে মিশেছে, খানিকটা যেন কুসংস্কার মুক্ত ধর্ম। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমরা জানি, ধর্ম অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং 'স্পিরিচুয়াল ভ্যালু'-র ভিত্তিতে মানুষের মূল্যবোধ এবং পথনির্দেশ করতে চায়। আর 'সেক্যুলার হিউম্যানিজম' হচ্ছে, যা একমাত্র পার্থিব জগৎকে স্বীকার করে, মানুষের প্রয়োজন এবং কল্যাণের জন্য সমাজ বিকাশের ইতিহাস এবং নিয়মকে অনুধাবন করে ও অনুসন্ধান করে। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মানুষের কল্যাণ নির্দেশ করতে চায়। এই দুটো পথ মানবতাবাদেরই পথ, কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী হিসাবে পার্থিব চিন্তা, পার্থিব এই জগৎ ও তার সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, মানুষের মূল্য দিয়েছেন এবং মানুষকেই 'আপহোল্ড' করেছেন। মানুষের প্রয়োজনের সমস্ত কথাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-সাহিত্যে উত্থাপিত হয়েছে । কিন্তু অধ্যাত্মবাদ সেখানে মানবতাবাদের সঙ্গে মিলেছে বলে সে মানবতাবাদে ইউরোপে প্রথম যুগে যে বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদ গড়ে উঠেছিল, ঠিক সেরকম পুরোপুরি সেক্যুলার মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটেনি। ... অনেকে প্রশ্ন করেন, রবীন্দ্রনাথ এতবড় কবি, এতবড় চিন্তানায়ক হওয়া সত্ত্বেও এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, নারী মুক্তির স্লোগান অসাধারণ প্রতিভার

সঙ্গে উপযুক্ত কুশলীর মতো উত্থাপন করলেও শেক্সপিয়রের ক্ষেত্রে যে উত্তাপটা আমরা অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর থেকে বড় কবি হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই উত্তাপটা দেখতে পাই না কেন? এই কেন'র উত্তর খুঁজতে হলে বুঝতে হবে যে, শেক্সপিয়রের জন্ম হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রথম যুগে যখন মানবতাবাদ বিপ্লবাত্মক, আর যখন রবীন্দ্রনাথের জন্ম পুঁজিবাদ তখন ক্ষয়িষ্ণু, তখন এ দেশের মানবতাবাদের মধ্যে জরাগ্রস্ততা এসে গেছে।

... এ আলোচনার উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথকে ছোট করা নয়। তাঁকে ছোট করবার আমার সাধ্য কী, আর কেনই বা আমি তা চাইব। আমি এখানে এই আলোচনার দ্বারা আসলে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল—এঁদের সাহিত্যচিন্তার মুখ্য শ্রেণিচরিত্র কী, তাই শুধুমাত্র নির্দেশ করতে চাইছি। কারণ কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের চিন্তার মধ্যে মুখ্য বা প্রধান শ্রেণিচিন্তা কী, তা ঠিক ঠিক ধরতে না পারলে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে কোনও সংস্কৃতি, যে কোনও সাহিত্য বা সাহিত্যচিন্তার ইতিহাস ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও সঠিক মূল্যায়ন অসম্ভব। ... তাই বিচার করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিরাট ও বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা, ভারতবর্ষে মানবতাবাদের দুই ধারার মধ্যে কোন ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি কোনও ধারারই প্রতিনিধিত্ব করেননি, তিনি নিজেই একটা ধারা। বিষয়টা ঠিক এরকম নয়। আসলে নিজে একটা ধারা বলতে যেটা বোঝায় বা বোঝাতে পারে তা হল, মানবতাবাদী ভাবধারার যে দু'টি বিশেষ রূপ আমাদের দেশে প্রকাশ পেয়েছিল তার মধ্যে যে ধারা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে-সাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছে, সে ধারার মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অবদানকে উপলব্ধি করা। ভারতবর্ষে যখন মানবতাবাদের স্ফূরণ ঘটল তখন বিশ্বচিন্তা হিসাবে মানবতাবাদের ক্ষয় ধরেছে। এ তো ঐতিহাসিক সত্য। একে অস্বীকার করে অনেকে বলেন, মানবতাবাদ একটা চিরকালের আদর্শ, সর্বকালের আদর্শ, সর্বসমাজের আদর্শ। এই চিন্তা অনৈতিহাসিক। কারণ মানুষের কল্যাণের চিন্তা মানেই মানবতাবাদ নয়। মানবতাবাদী চিন্তা বলতে চিন্তার একটা বিশেষ ক্যাটিগরি বা কাঠামোকে বোঝায়। বুর্জোয়া রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিপ্লবের পিছনে ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারী স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং তার ভিত্তিতে চিন্তার বা আদর্শের যে পুরো কাঠামোটি যুক্তিকে কেন্দ্র করে, বিজ্ঞান ও ইতিহাস চর্চাকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরবাদ, অতিপ্রাকৃতবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তদানীন্তন 'বস্তুবাদী ধারণা'-র উপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে, তাকেই আমরা বলি মানবতাবাদ বা বুর্জোয়া মানবতাবাদ। তাই মানবতাবাদ বুর্জোয়া সভ্যতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। বুর্জোয়া অর্থনৈতিক এবং উৎপাদন ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবেই মানবতাবাদ গড়ে উঠেছিল। বুর্জোয়া সভ্যতার ক্ষয় ধরার

সাথে সাথে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্ষয় ধরার সাথে সাথে বুর্জোয়া মানবতাবাদের মধ্যেও ক্ষয় ধরেছে। এই অবস্থায় সে তার বিকাশের প্রথম যুগের মূল্যবোধগুলোকে নিয়ে আর চলতে পারছে না। তার পরিবর্তে সে ধর্ম এবং অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে পুরোপুরি আপস করার চেষ্টা করছে, বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণ ঘটাবার চেষ্টা করছে। এরই 'এক্‌স্ট্রিম পোল'-এ একদিকে ঘটল ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান, আর মানবতাবাদীদের যে অংশটি না পারল 'এস্‌কেপিস্ট' হতে, না পারল ধর্মের সঙ্গে হাত মেলাতে এবং যারা পূর্ণ 'সেক্যুলার মানবতাবাদ'-এর সেই যুক্তিবাদী মনকেই জিইয়ে রাখতে চাইল, অথচ বুর্জোয়া মানবতাবাদের পরিধি, তার যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার যে সীমা স্থানকালের দ্বারা নির্ধারিত — সেই সীমা অতিক্রম করে সমাজ বিপ্লবের নতুন চিন্তায় নিজেদের আলোকিত করতে পারল না — তারা 'এগ্‌জিস্‌টেন্সিয়ালিজমে'র জন্ম দিল। মানবতাবাদের এই দুটো 'এক্‌স্ট্রিম' পরিণতি পরবর্তীকালে ইউরোপে আমরা দেখতে পাই। মাঝখানে বহুদিন ধরে মানবতাবাদ চেষ্টা করেছে ধর্মকে সংস্কার করে 'এসেন্স অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি'কে মিলিয়ে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলবার। এই পটভূমিতে আমাদের দেশে মানবতাবাদের এবং নবজাগরণের শুরু, তার অগ্রগতি এবং তার পরিণতি।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাচ্ছি, তখন তাঁর মধ্যে মানবতাবাদের সুরগুলো কোথাও কোথাও এবং কখনও কখনও প্রথম যুগের সেই বলিষ্ঠতাগুলো পেয়েছে, বিশেষ করে তাঁর কবিতার মধ্যে তা ফুটে উঠেছে। অনেক কবিতার মধ্য দিয়ে সেই 'মিলিট্যান্ট ফারভার', সেই বিপ্লবাত্মক বলিষ্ঠতা, 'আনকম্প্রোমাইজিং টোন' রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা পাই। তবে, রবীন্দ্র সাহিত্যচিন্তার মূল কাঠামোটা যদি আমরা গভীরভাবে বিচার করি তাহলে দেখতে পাব যে, সেখানে অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে, ঈশ্বরচিন্তা-উদ্ভূত মূল্যবোধের সঙ্গে মানবতাবাদী মূল্যবোধের একটা সংমিশ্রণ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে, তাঁর চিন্তার মধ্যে, নাটকের মধ্যে, উপন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এগুলো ঘটেছে এ কারণেই যে, রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই চিন্তাকেই, যাকে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা বলি 'ন্যাশনাল রিফর্মিজম'।

...স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও দেশপ্রেম কারোর চেয়েই রবীন্দ্রনাথের কম ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদারনৈতিক। ... বিপ্লবপন্থাকে তিনি সমর্থন করেননি। তিনি মনে করেছেন, এই পথ হল ভুল পথ। তাই তাকে তিনি 'কন্‌ডেম' (নিন্দা) করেছেন। ... কিন্তু ভারতবর্ষের বিপ্লববাদের মধ্যে যে তারুণ্য, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবীদের মধ্যে যে প্রাণ দেওয়ার

ক্ষমতা, তাঁদের মধ্যে যে ত্যাগ করার ক্ষমতা — পথ ভুল হোক বা শুদ্ধ হোক তাঁরা যে আত্মত্যাগ করেছেন — তাকে অস্বীকার করতে রবীন্দ্রনাথ পারেননি। তাই তাঁদের সম্পর্কে প্রশংসাও তিনি করেছেন। যদিও তারিফ করেছেন তাঁদের প্রাণ ত্যাগ করা, প্রাণ দেওয়ার ক্ষমতাটাকে। কিন্তু আদর্শগত দিক থেকে ভারতবর্ষের পেটিবুর্জোয়া বিপ্লববাদের ত্রুটি কোথায়, কোন ত্রুটি থেকে মুক্ত হলে এ বিপ্লববাদ এগোতে পারে, সেইসব দিকে তিনি কিছু বলেননি। তাঁর মতে এই বিপ্লবী অভ্যুত্থানের রাস্তাটাই ভুল। তাই তিনি বিপ্লববাদকে পথ হিসাবে দেখাতে চাননি। তিনি সৃষ্টি করেছেন 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র চরিত্র। খাড়া করেছেন 'চার অধ্যায়'। আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে, 'চার অধ্যায়' খাড়া করেছিলেন বলে বাংলার বিপ্লবীদের তারুণ্য এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে কোথাও রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি, এ আমার বক্তব্য নয়। তাঁদের তারুণ্য এবং আত্মত্যাগকে তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। বিপ্লবী চরিত্রগুলির বাস্তবকে তিনি অস্বীকার করবেন কী করে? কারণ তিনি তো একজন বড় মানুষ। ... আসলে মানবতাবাদের অভ্যুত্থানের যুগ এবং তার ক্ষয়িষ্ণু যুগের বৈশিষ্ট্যগুলিকে না বুঝলে রবীন্দ্রনাথকে ঠিকমতো বোঝা হবে না, তাঁকে খাটো করা হবে। মনে হবে, তিনি যেন ইচ্ছাকৃতভাবে এসব করেছেন। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথ যদি বুর্জোয়া সমাজ, সভ্যতা, এমনকী বুর্জোয়া আন্দোলনের উপরতলার শ্রেণি থেকে নিজেকে বিচ্যুত করে শ্রমিক আন্দোলন, বাংলার বিপ্লববাদ, সাধারণ মানুষদের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারতেন, তাহলে হয়ত তিনিই বিপ্লবাত্মক মানবতাবাদের প্রবক্তা হতেন এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে প্রতিভা ছিল, তাতে নিঃসন্দেহে এই 'ট্রানজিশনাল ফেজ'-এর মুখোমুখি এসে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতির ইঙ্গিতও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই হয়ত আমরা পেতাম। আবার এও সত্য যে, জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি সাহিত্য সাধনা সহ বহু বিষয়ে নিজের অপূর্ণতাকে গভীর বেদনায় উপলব্ধি করেছিলেন। সে নিয়ে তাঁর আক্ষেপও ছিল। সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষের কাছে যে তিনি পৌঁছাতে পারেননি, এ নিয়ে তাঁর গভীর ব্যথা ছিল। শুধু তাই নয়, জীবনের শেষ অধ্যায়ে চিন্তাজগতের বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়।

এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমাদের একথা স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথকে না বুঝলে আমরা কিন্তু তাঁর মধ্যে মানবতাবাদের চিন্তা-ভাবনা, মূল্যবোধগুলি ব্যাপ্তি নিয়ে যতটা দেখা গিয়েছিল, তার সবটার সঙ্গে পরিচিত হতে পারব না। সেক্ষেত্রে মানবতাবাদের পুরো পরিমণ্ডলকে আমরা উপলব্ধি করতে পারব না। রবীন্দ্রসাহিত্য এবং কাব্যচিন্তার সঙ্গে প্রকৃত অর্থে

পরিচিতি ঘটলে বা সোজা কথায় সমগ্র রবীন্দ্রনাথ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়লেই একমাত্র তখনকার সংস্কৃতিতে মানবতাবাদের কতটা ব্যাপ্তি ঘটেছিল তার সম্যক উপলব্ধি আমাদের হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, তাঁর অবদান নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। শুধু যেটুকু লক্ষ করতে হবে সেটুকু হচ্ছে, রবীন্দ্রচিন্তার সীমা। তাকে নির্দেশ করতে হবে এবং অনুধাবন করতে হবে।

...আজ রাষ্ট্রজীবনের ক্ষেত্রে, জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? দেখতে পাচ্ছি চূড়ান্ত অবক্ষয়। নিষ্ঠা-সততা সবই যেন হারিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'। যাঁরা রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি করেন, রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে দু'বেলা 'প্রাইজ' নিয়ে ঘরে ফিরছেন, তাদের মধ্যে আছে নাকি এর বিন্দু-বিসর্গ প্রভাব? যে মা মেয়েকে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাওয়াচ্ছেন, যে বাবা ছেলেকে বা মেয়েকে নিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের আসরে যাচ্ছেন, সেই বাবা-মায়ের মধ্যে এ মূল্যবোধ ক্রিয়া করছে কি? রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে, ভাবের মধ্য দিয়ে এই ধরনের চিন্তাই প্রতিফলিত — রবীন্দ্র চিন্তার এটা একটা মূলমন্ত্র, মূল বিষয়বস্তু। তিনি দেখিয়েছেন, অন্যায় সইলে অন্যায়ের অস্তিত্বকে বেঁচে থাকবার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ফলে তার দ্বারা মানবিকতা, মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। অন্যত্র বলছেন, নীতি-আদর্শের দিক থেকে একটা জিনিসকে যদি কেউ উচিত বলে মনে করে, তাহলে তার জন্য 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'। অর্থাৎ কেউ যদি কোনও কাজ সঠিক বলে মনে করে, তার ডাকে যদি কেউ সাড়া নাও দেয়, তাহলেও সে প্রয়োজনে একলাই চলবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে একা হলে একলাই চলবে, কোনও কিছুর পরোয়া করবে না। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ধরনের মূল্যবোধের অনেক সুন্দর ও মূল্যবান কথা আছে, যা জাতির নীতি-নৈতিকতার মেরুদণ্ড খাড়া করে দিতে পারে। বেদনার হলেও এ কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতির যে মেরুদণ্ড খানিকটা খাড়া ছিল, আমাদের ভাঙা মেরুদণ্ড সিধে হয়েছিল, তা আজ আবার একেবারে ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে। ... ওরা (আজকের শাসকরা) বলে না ক্ষুদিরামের মতো হও, ওরা বলে না যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিল তাদের তেজে তোমরা জাগো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য কোনও কিছু তোমরা পরোয়া করো না। ওরা বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে বলে না।

... দেশের লোকের সামনে এই সত্য কথাটা তুলে ধরতে হবে যে, বুর্জোয়া স্বাধীনতা, বুর্জোয়া দেশাত্মবোধ, বুর্জোয়া আদর্শবাদ বা মতবাদ—এসব আজ আর

ভারতবর্ষের শোষিত জনসাধারণকে পথ দেখাতে পারে না। তাই একদিন যে মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্যচর্চা করতে গিয়েও রাজনৈতিক আন্দোলনের কম্পনে শরৎচন্দ্র কেঁপেছেন, নজরুল কেঁপেছেন—আজকের সাহিত্যিকদের বুকে তার এতটুকুও আলোড়ন নেই ... আজকের বুর্জোয়া মানবতাবাদীরা হচ্ছেন ক্রিয়াহীন তাত্ত্বিক, উন্নাসিক, জীবনে নির্ঝঞ্ঝাট—মাঝে মাঝে আসর গরম করেন রবীন্দ্র ব্যাখ্যা করে, শরৎ ব্যাখ্যা করে, নজরুল ব্যাখ্যা করে। আমি বলি, রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রচার করার তোমার তখনই অধিকার, যখন রবীন্দ্রনাথের বুকের বেদনাটা তুমি আজও বুকে বহন কর। যার মধ্যে সে যন্ত্রণা নেই, সে কী শেখাবে? ... চব্বিশ ঘণ্টা যাঁরা রবীন্দ্র সংস্কৃতির উপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের জীবনে এ ব্যথা-বেদনা কই? অস্থিরতা কই? চোখের সামনে অন্যায় দেখে তাঁরা যন্ত্রণায় ছটফট করছেন কোথায়? তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তাঁরা বেরিয়ে আসছেন কোথায়? ... সংস্কৃতি যদি সংস্কৃতির উপর শুধু বক্তৃতা করতে শেখায়, আর বড় বড় কথা বলতে শেখায়, তাহলে তা দুর্ভাগ্যজনক।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমি বলতে চাই। তা হচ্ছে, আমাদের জানা দরকার, একজন বড় কবি বা সাহিত্যিকের প্রয়োজন ঠিক কোন জায়গায়। সমাজে তাঁর এত মূল্য কেন? সাহিত্যিকরা ছাড়াও সমাজে দার্শনিকরা রয়েছেন, বৈজ্ঞানিকরা রয়েছেন, সমাজতাত্ত্বিকরা রয়েছেন, ইতিহাসবেত্তারা রয়েছেন, মনস্তাত্ত্বিকরা রয়েছেন। তাঁরা সকলেই বিশেষ বিশেষ শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাকে মানুষের সামনে তুলে ধরেন। ফলে শুধুমাত্র চিন্তার মাল-মশলা পাওয়ার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা নেই। আসলে বুদ্ধি দিয়ে যে মানুষ বড় চিন্তা গ্রহণ করতে পারে না, সেই বড় চিন্তা-ভাবনার বিষয়গুলো রসের মাধ্যমে, শিল্পকৌশলে মানুষের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাই হল সাহিত্যের যথার্থ প্রয়োজনীয়তা, কাব্যের সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা। এইজন্যই সাহিত্যিকরা দার্শনিক বা রাজনৈতিক চিন্তানায়কদেরও নমস্য ব্যক্তি হন। আবার সাহিত্যিকরা তদানীন্তন সময়কার চিন্তানায়ক এবং রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে চিন্তা-ভাবনার উপাদান পান বলে তাঁদেরকেও তাঁরা শ্রদ্ধা করেন। এঁরা পরস্পর পরস্পরের মূল্য বোঝেন। ... একটা সমাজ সম্পর্কে উপলব্ধি আপনারও আছে, আমারও আছে, দার্শনিকেরও আছে। কিন্তু কবি বা ঔপন্যাসিক শিল্পশৈলীর জারক রসে চুবিয়ে রসের মাধ্যমে যখন সেই উপলব্ধিকে পরিবেশনা করেন বা সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন, তখন বুদ্ধি দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার দরকার হয় না। ... গল্প বা কাব্যের মধ্য দিয়ে আপামর মানুষের মধ্যে রসের মাধ্যমে সাহিত্যিক উন্নত চিন্তা-ভাবনাগুলি ঢুকিয়ে দেন। এমনকী পাঠক জানতেও

পারে না যে, সে একটা বড় জিনিস গ্রহণ করল। ... শিল্পশৈলীর অর্থে এটি একটি অমোঘ অস্ত্র, যার মাধ্যমে কোনও সাহিত্যিক যদি সাহিত্য পরিবেশনা করতে পারেন এবং তাঁর সাহিত্যের মধ্যে যদি উচ্চ ভাবনা-ধারণার বিষয়বস্তু কিছু থাকে, তাহলে সেই সাহিত্যের প্রভাব যত বিস্তার হতে থাকবে, তত কিছু না বুঝে হলেও সাধারণ মানুষের মানসিকতার মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটবে এবং উন্নতিসাধন হবে। ... রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মানবতাবাদের বড় ভাবনাধারণা, রুচি-সংস্কৃতি- মূল্যবোধ যে রয়েছে, এটা কেউ অস্বীকার করে না। ... রবীন্দ্রসাহিত্যে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা রয়েছে। নায়ক-নায়িকার মধ্য দিয়ে নাটকে, উপন্যাসে ডায়লগের ছলে নানান বিষয় অবতারণা করে চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি যুক্তিতর্ক বা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন। ... কিন্তু মূলত ছোট গল্প এবং কাব্যের ক্ষেত্র ছাড়া সেই বিষয়বস্তুগুলো মানুষের মনের মধ্যে বুদ্ধির সহায়তা ছাড়াই — যেটাকে আমরা রসের মাধ্যম বলি — ঢুকে গিয়ে তার স্বভাবে, তার রুচিতে, তার চিন্তা-ভাবনার প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সমস্ত ক্ষেত্রে তেমন করে পারেনি। ... এই রসসৃষ্টিই সাহিত্যের মূল আবেদন। এই আবেদনটা যদি একটা সাহিত্যের মধ্যে কম থাকে, তাহলে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বড় ভাবনা-চিন্তাগুলো প্রকাশিত হলেও আপামর জনসাধারণের মধ্যে সেই বড় ভাবনা-ধারণাগুলো ঢুকতে পারে না। সেটা শুধু 'বুদ্ধিজীবী'দের মধ্যেই সীমিত থেকে যায়। ... রবীন্দ্রসাহিত্যের একটা বিরাট অংশ উপলব্ধি করতে হয় বা গ্রহণ করতে হয় বুদ্ধির মাধ্যমে। তাই সর্বসাধারণের মধ্যে তা তেমন করে ঢুকতে পারেনি। আর না ঢুকতে পারার ফলে সর্বসাধারণের রুচি-সংস্কৃতির উপর তা গভীরে প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ... এই কারণে তিনি যে বড় বা উন্নত ভাবগুলো তুলে ধরতে চেয়েছেন, সাধারণ মানুষ তা পড়লেও এবং পড়ে শ্রদ্ধাশীল হলেও — বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই বলে সেখান থেকে বিশেষ কিছু গ্রহণই করতে পারেনি। তা থেকে গিয়েছে মূলত বুদ্ধিজীবীদের জন্য এবং সেই বুদ্ধিজীবী বলতে মূলত বলতে হয় যাঁরা উপরতলার বুদ্ধিজীবী তাঁদের জন্য।

... এ কথা তো ঠিক যে, যাঁরা রবীন্দ্র সংস্কৃতির চর্চা করবেন তাঁদের যদি সাহসের সঙ্গে অন্যায়ের মোকাবিলা করবার, অর্থাৎ 'নিজে অন্যায় করব না, অপরকে অন্যায় করতে দেব না' এবং 'অন্যায়ের ফলে দেশ ডুবে যাচ্ছে যদি দেখতে পাই, তাহলে তার প্রতিবাদ করবার জন্য সামনে এগিয়ে আসব'— এই মানসিকতা না থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথের জয়গান গাওয়া, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বড় বড় দুটো কথা বলার সত্যিকারের তাৎপর্য কোথায়? 'রবীন্দ্রনাথের মতো চিন্তানায়ক

বিশ্বে কোনওদিন আসেনি', 'রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরব' বলে আকাশ-পাতাল মথিত করার কী অর্থ, যদি জীবনের ক্রিয়ায় সেই মূল্যবোধ প্রতিফলিত না হয়? আর তাঁদের জীবনে যদি তা না হয়ে থাকে, তার অর্থ তো এই যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা সুবিধাভোগের হাতিয়ারে পর্যবসিত করেছেন। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা ভাঙিয়ে খেতে চাইছেন, তার দ্বারা নিজেদের আখের গোছাতে চাইছেন। এ এক ধরনের তথাকথিত 'ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাশান'। এঁরা এক ধরনের 'বুদ্ধিজীবী', যাঁরা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নানা আলোচনা করেন, প্রায়শই বড় বড় কথা বলেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মনের ভিতরে যে ব্যথা সেটা তাঁরা বহন করেন না। সমাজমননে যে যন্ত্রণা, তার কোনও চিহ্ন তাঁদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সময় সমস্যা ছিল সামন্ততান্ত্রিক কূপমন্ডুক সমাজব্যবস্থা ও ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে দেশের মুক্তি। আর আজকের সমস্যা হচ্ছে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য যে তথাকথিত গণতন্ত্র আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা-জনিত মানুষের জীবনের সমস্ত রকমের দুর্দশা, তার নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা। এই সর্বব্যাপক অধঃপতনের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাবার. জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদের মনোভাব নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করতে চেয়েছেন, তাঁর মতো করেই করেছেন। সাহিত্য-সাধনা করেছেন বলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে চাননি, এমন তো নয়। ফলে, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে সত্যিই শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা তো যেটাকে অন্যায় বলে মনে করছেন তার প্রতিবাদ করবেন, মনুষ্যত্বের মর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরবেন, মানুষের স্বার্থকে এবং মানুষকে বড় করে দেখবেন। তার কল্যাণের কথা, সমাজের অগ্রগতি এবং সামগ্রিক কল্যাণের কথা আগে চিন্তা করবেন, তারপর নিজের কথা, ব্যক্তির কথা চিন্তা করবেন। এই সমস্ত বিষয়গুলো রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-ভাবনার মধ্যে তো ছড়িয়ে আছে, এ কথা তো কারোর অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু একে ভিত্তি করে যদি আমাদের জীবনে ক্রিয়া করতে না পারি, তাহলে রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা শিখলাম কী, রবীন্দ্রনাথ থেকে আমরা নিলাম কী, আমাদের জাতি কী নিতে পারল? এই ক্রিয়াকে বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথা যাঁরা বলবেন তাঁরা তো আসলে 'স্যুডো' বা 'মেকি' রবীন্দ্রভক্ত। এই মেকি রবীন্দ্রভক্তরাই এদেশে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আসর জমিয়ে রয়েছেন। আর স্বাধীনতার পর শাসক সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথকে তাদের সুবিধায় পর্যবসিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের সুনাম, রবীন্দ্র-প্রতিভাকে তাদের শাসন-শোষণ কায়েম রাখার সপক্ষে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

... মনে রাখতে হবে, একটা যুগে রবীন্দ্রনাথ যে মানবতাবাদী চিন্তার দ্বারা

দেশকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, সেই মানবতাবাদই আজ শোষকশ্রেণির হাতে শোষণের অস্ত্র হয়েছে। আজ নতুন আদর্শের প্রয়োজন সমাজের অগ্রগতির জন্য। আমি এখানে লেনিনের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। লেনিন একসময় টলস্টয় সম্পর্কে বলেছিলেন, টলস্টয় রাশিয়ার বুকে মানবতাবাদের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আজ টলস্টয়ের মানবতাবাদকে যদি আদর্শগত ক্ষেত্রে পরাস্ত করতে না পারা যায় তাহলে সর্বহারা বিপ্লব জয়যুক্ত হবে না। এই লেনিনই আবার একইসাথে বলেছেন, টলস্টয় সর্বহারা বিপ্লবের জমি তৈরি করেছেন — টলস্টয়কে বাদ দিলে রাশিয়ায় সর্বহারা বিপ্লব হত না। টলস্টয় যদি জারতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমাজমননকে বা তার মানসিকতাকে, তার সুপ্ত বিবেককে চাবুক মেরে মেরে জাগ্রত না করতেন, তাহলে সর্বহারা বিপ্লবের জমিই তৈরি হত না। তাই টলস্টয়ের কাছে আমরা ঋণী। এই ছিল লেনিনের বক্তব্য। প্রায় অনুরূপ অবস্থা আমাদের। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা নজরুল না এলে ভারতবর্ষের নবজাগৃতি সম্ভব হত না, কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সমাজ মানসিকতা বা মনন, গণতান্ত্রিক চেতনা, যুক্তিবাদী মন কোনও কিছুই এদেশে গড়ে উঠত না। এঁরা সেগুলি গড়ে তুলেছেন। অথচ মানবতাবাদের চিন্তাধারা আজকে পুরোপুরি শাসকশ্রেণির সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। একথার মানে কি এই যে, রবীন্দ্রনাথ জনগণের সম্পদ নন? অবশ্যই তিনি জনগণের সম্পদ। সম্পদ এই অর্থে যদি আমরা বুঝতে পারি যে, আজকের যুগের প্রয়োজনে সামগ্রিকভাবে মানবতাবাদের সীমা এবং সে অর্থে মানবতাবাদী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার সীমা নির্দেশ করে তার থেকে এগিয়ে গিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম আমাদের দিতে হবে। এও আমাদের বুঝতে হবে যে, বুর্জোয়া মানবতাবাদের যেটা বিপ্লবাত্মক ধারা তার ধারাবাহিকতাতেই সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম হবে। তবুও রবীন্দ্র-সংস্কৃতি সর্বহারা বিপ্লববাদের জমি তৈরি করেছে, একথাকে অস্বীকার করা যাবে না। তার কারণ এই যে, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া মানবতাবাদ সর্বহারা মানবতাবাদের জমি তৈরি করে। সেই জমি মানবতাবাদের প্রবক্তা রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন এবং সে অর্থে রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং অশেষ পূজনীয় ব্যক্তি। তাঁর দান ভারতবর্ষের শ্রমিক বিপ্লবও অস্বীকার করতে পারবে না — যদি না শ্রমিক বিপ্লবীরা এভাবে ভাবে যে, তাদের বিপ্লবের তত্ত্বটা আকাশ থেকে পড়েছে। কোনও সর্বহারা বিপ্লবী, কোনও সাম্যবাদী, কোনও শ্রমিক বিপ্লবী — যতদূর আমি জানি, লেনিন থেকে আরম্ভ করে মাও সে তুঙ পর্যন্ত — যাঁরা যে দেশে যখন বিপ্লব করেছেন, তখন তাঁদের কেউই এইভাবে ভাবেননি। তাঁরা সবসময়ই ভেবেছেন অতীতের সমস্ত চিন্তানায়করা তাঁদের যুগের বা চিন্তা-ভাবনার

সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেই আন্দোলনের দ্বারা সমাজটাকে যতদূর এগিয়ে দিয়েছেন, সেইটিই তার পরবর্তী সমাজব্যবস্থা গঠন করার জমি তৈরি করেছে। এই অর্থে সমস্ত যুগের অগ্রসর বিপ্লববাদ হচ্ছে অতীতের সমস্ত মনীষী এবং সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনগুলিরই উত্তরসুরি।

... আর, উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হওয়ার মানেই যাঁদের আপনারা উত্তরাধিকারী তাঁদের সঙ্গে আপনাদের চিন্তাগত বিরোধ ঘটবে। যাঁরা পরিবর্তিত অবস্থাতেও শুধু সেই পুরনো চিন্তারই জাবর কেটে চলেছে, তাঁরা তাঁদের উত্তরাধিকারী তো নয়ই, উপরন্তু এইসব স্তাবকেরা যে সংস্কৃতি একদিন লড়াইয়ের হাতিয়ার ছিল, তাকে আজ 'প্রিভিলেজে' পর্যবসিত করেছে। ... আজ আর শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের প্রশস্তি গাইলেই চলবে না। এঁদের সাহিত্যচিন্তার মুখ্য শ্রেণিচরিত্র নির্ণয় করে, সম্পূর্ণ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে এঁদের মূল্যায়ন করার যে প্রয়োজন রয়েছে — সে ব্যাপারে জনসাধারণকে আপনাদের সাহায্য করতে হবে। রামমোহন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল প্রভৃতিরা সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে স্তরে স্তরে যে উন্নত পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন, ঠিক সেইখান থেকে আপনাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের শুরু। ঠিক সেইখান থেকেই হবে সর্বহারা সংস্কৃতির জয়যাত্রার শুরু। এর সাথে কিন্তু আর একটা কথাও আপনাদের মনে রাখতে হবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এদেশের বুর্জোয়া মানবতাবাদী আন্দোলনের ... মধ্যে মূলত মানবতাবাদের আপসহীন যৌবনোদ্দীপ্ত ও বিপ্লবাত্মক ধারার ... ধারাবাহিকতায় ও তার সাথে ছেদ ঘটিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতির জন্ম। ... আজ প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সামনে প্রধান কাজ হচ্ছে, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে ঝান্ডাটি রাজনৈতিক নেতারা রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের তাড়াহুড়ায় অবহেলায় ফেলে দিলেন, যে ঝান্ডাটি গণতন্ত্রীরা, সমাজতন্ত্রীরা ও মেকি সাম্যবাদীরা ভোটের রাজনীতিতে অসুবিধা হতে পারে এই ভয়ে আজও অবহেলায় ফেলে রেখেছেন, সেই ভূলুণ্ঠিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাটিকে আজ আপনাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে এবং ক্রমাগত জ্ঞানের আলোকে তাকে আরও উদ্ভাসিত করতে হবে। 'বিশুদ্ধ সংস্কৃতি'র চর্চা ও সর্বপ্রকার বুর্জোয়া ভাবধারার আক্রমণকে প্রতিহত করে আপনারা যদি এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে স্তরে স্তরে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সর্বহারা বিপ্লবের পরিপূরক এমন একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশে গড়ে তুলতে পারেন, তবেই আপনারা হবেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও নজরুল সংস্কৃতির সত্যিকারের উত্তরসাধক। ... তাই সর্বহারা সংস্কৃতির আন্দোলন যাঁরা আজকে করবেন তাঁদের মনে রাখতে হবে, আপনারা ওই রেনেসাঁসের বুর্জোয়া

মানবতাবাদী আন্দোলন এবং সংস্কৃতির উত্তরসাধক বলেই আপনাদের সঙ্গে আদর্শ ও যুক্তিবাদের প্রশ্নে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে, শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে মৌলিক পার্থক্যও ঘটবে। যাঁরা স্তুতি করে তাঁদের পার্থক্য ঘটে না। তাঁরা উত্তরসাধক নয়, তাঁরা স্তুতিকার। রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন তাঁরা হুবহু সেই কথাগুলো মুখস্থের মতো বলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন এবং যে অনুভূতি থেকে বলেছেন, তেমন করে তাঁরা বলতে পারেন না। কারণ যিনি বলছেন তিনি তো রবীন্দ্রযুগেরও মানুষ নন, রবীন্দ্রনাথের মতো বড় মানুষও নন। ফলে তার থেকে সেটা আরও নিচু স্তরের হয়। এইভাবে স্তুতি করতে থাকলে যে সংস্কৃতি একদিন উঁচু স্তরের ছিল, সেই সংস্কৃতির আবেদনটা অনেকখানি কমে যায় এবং নিম্ন স্তরের হয়ে পড়ে। ফলে স্তুতি যথার্থ অর্থে কোনও সংস্কৃতি নয়। রবীন্দ্র সংস্কৃতি তদানীন্তন সময়ে সমাজে একটা ভূমিকা পালন করেছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগে যা করবার সেইটি আজকে সৃষ্টি করতে হবে এবং এর জন্যই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন দরকার। ... সঠিক মূল্যায়ন না করলে রবীন্দ্র ভাবনা-ধারণা আমাদের নাড়ের মধ্যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবে না। সঠিক মূল্যায়নের দ্বারা তার সীমা নির্দেশ করে এবং অতীতে তার যা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল তা অনুধাবন করে, তার ভিত্তিতে উত্তরসুরি হিসেবে আমাদের বর্তমান সময়ের সংস্কৃতি কী হওয়া দরকার তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে হবে। সেটা নির্ধারণ করতে গেলে তাঁর মানবতাবাদের ব্যাপ্তির পুরো দিকটাকে আমাদের বুঝতে হবে। সাথে সাথে তার সীমাবদ্ধতার দিকগুলোকে কাটিয়ে তাকে পৌঁছে দিতে হবে সর্বহারা সংস্কৃতিতে পরিণতি লাভ করার দিকে — যে সংস্কৃতি একটা নতুন নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক মান গড়ে তুলবে এবং যে সাংস্কৃতিক মান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদকল্পে মানুষের লড়াই করবার সংস্কৃতিগত, রুচিগত মানসিকতা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। এই কাজটি যদি বর্তমান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকরা করতে পারেন, তবেই রবীন্দ্রসংস্কৃতি চর্চার যথার্থ সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম পুরোধা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ও ভূমিকা নিয়ে ১৯৭৩ সালের ২৮ মে একটি আলোচনা করেন। সেই আলোচনাটির সাথে 'ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য', যুবসমাজের প্রতি' এবং শরৎ মূল্যায়ন প্রসঙ্গে' আলোচনা থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ যুক্ত করে এই পুস্তিকাটি ২০১০ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়।